Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Construction of a Unexploited Developed Society as the Chief Aim of Marxism

শোষনহীন এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থাই মার্কসবাদের মূল লক্ষ্য

Debnath S.

Dept of Philosophy, Tripura University, India

Abstract

Normally we think that the aim of Marxism is social change. But the aim of Marxism is not only that, their aim is to form a developed society. So, in this paper I made an attempt to discuss how Marxism wants to give a developed form to the society through the dialectical method. According to Karl Marx exploitation in society is due to the private property. Because the property owners always try to exploit the labour class for getting more and more amount of money from their property. So Marx tries to abolish the private property from the society. He argues that the abolition of private property means in essence the social ownership of the principal means of production. And production by machines must be taken away from the owners but the technique has to be used for the benefit of the whole society. The aim of Marxism is man's all-round development. Marx thinks that this all-round development will not come automatically. It has to be achieved through the dialectical struggle of man himself. This dialectical struggle is not mere blind helpless protest. It is to fight for establishing the socialist society. Thus Marx brings in to existence the real socialist movement for establishment of an unexploited developed society.

Keywords: Social change, Developed form of society, Private property, Social ownership, Dialectical struggle

Article

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে কাম্য সমাজ ব্যবস্থা :-

সাধারনত আমরা মার্কসবাদ বলতে বুঝি সমাজের কাম্য পরিবর্তন । অর্থাৎ দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে পুরানো সমাজ ব্যবস্থার পত্তন ঘটিয়ে শোষনহীন এক নতুন সমাজ গঠন । আমরা জানি কার্ল মার্কস ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । ভাববাদী দার্শনিকেরা মনে করেন পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাই ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত এবং সবকিছুই ইশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । হেগেলের মতে "The State is the march of God on earth"[১] (রাষ্ট্র হল পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদক্ষেপ) । কিন্তু কার্লমার্কস এরূপ মন্তব্য স্বীকার করেন না । তিনি বলেন জগতের কোন পরিবর্তনই ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয় । আবার হেগেল যেখানে Idea বা ভাব নামে এক স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, যেখানে হেগেল বলেছেন বস্তু জগৎ হল এই Idea বা ভাব এর বাহ্যিক দৃশ্যরূপ সেখানে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথম থেকেই হেগেলের ভাববাদী চিন্তাধারার বিরোদ্ধে প্রয়াসী ছিলেন । মানুষের কর্ম, চিন্তা, ভাবনা সবকিছুই যে বস্তু জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তারা তা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । মার্কস এবং এঙ্গেলস তাই বলেন "The production of Ideas, of conceptions, of consciousness, is at first directly interwoven with the material activity and the material inter course of men, the language of real life.

Conceiving, thinking, the mental intercourse of men, appear at this stage as the direct efflux of their material behavior. The same applies to mental production as expressed in the language of politics, laws, morality, religion, metaphysics etc. of a people. Men are the producers of their conceptions, ideas etc. real active men, as they are conditioned by a definite development of their productive forces and of the intercourse corresponding to these, up to its furthest forms. Consciousness can never be anything else than conscious existence and the existence of men is their actual life process."[2] এই ভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস শুধু হেগেলের মতবাদ থেকেই ভিন্নমত পোষন করেননি, বরং প্লেটোর মতকে ও তারা অতিক্রম করে কেননা প্লেটো বলেছেন 'পরম সত্তার প্রতিভাস হল জগৎ' ।[৩] এইভাবে হেগেল ও প্লেটোর তত্ত্বকে অতিক্রম করে তারা সমাজের পরিবর্তনের এক জাগতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের মতে সমস্ত পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে জাগতিক কারন। হেগেল যেমন বলেন সমস্ত সৃষ্টি তত্ত্বের পেছনে রয়েছে দ্বন্দ্ব মার্কস ও স্বীকার করেন যে সৃষ্টি ও পরিবর্তনের মূলে রয়েছে দ্বন্দ্ব। কিন্তু হেগেল ও মার্কসের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি এক নয়। মার্কসের মতে দ্বন্দ্ব বাইরের কোন অতি জাগতিক কারনে হয় না । বরং দ্বন্দ্বের কারন হল ভাব বা চেতনা । এইভাবে যদিও মার্কস হেগেলের ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিজে হেগেল থেকে ভিন্নমত পোষন করেন এবং বলেন জগতের সমস্ত পরিবর্তন দ্বন্দ্বের উপর নির্ভরশীল । দ্বন্দ্ব হল জাগতিক বস্তু বা জাগতিক মানুষের দ্বন্দ্ব । তাই সমাজ পরিবর্তন সম্ভব হয় জাগতিক মানুষের দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে । সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে এই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যখন কোন একটি শক্তিশালী শ্রেনী বা গুষ্ঠী বৃহৎ সমাজ ব্যবস্থাকে বা অপর শ্রেনীর উপর শাসন ও শোষন অব্যাহত রাখে । তখন দূর্বল শ্রেনী তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় । আর তখনই দেখা দেয় দুটি শ্রেনীর মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব । মার্কস যার নাম দিয়েছেন শ্রেনী সংগ্রাম । আর এই শ্রেনী সংগ্রাম বা একটি শ্রেনীর সঙ্গে অপর শ্রেনীর দ্বন্দ্বের কারন হল পুরোনো শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে এক নতুন শাসন ব্যবস্থার প্রর্বতন যেখানে থাকবে না পুরোনো দিনের সেই শোষন । এই ভাবে প্রতিটি বারই সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য হল পুরোনো ও অনুন্নত শাসক শ্রেনীর বা শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থার গঠন । সোজা কথায় সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, পুরোনো শ্রেনী বিভক্ত ও অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে এক শ্রেনীহীন সমানাধিকার ভিত্তিক উন্নত সমাজ ব্যবস্থার পত্তন । এর একটা জ্বলন্ত উদাহরন হল ১৯১৭ সালের সোভিয়েত বিপ্লব ও পরবর্তি সমাজ ব্যবস্থা ।

ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে সমাজ বির্বতনের ধারা ঃ-

এখানে উল্লিখিত দ্বন্দ্ব শব্দটিকে বিভিন্ন দার্শনিক 'ডায়ালেটিক' নামে উল্লেখ করেছেন । এই ডায়ালেটিকের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে ''কোন পদার্থই নিত্য, চূড়ান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় নয় ; অথবা প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে তাহার পরিবর্তনের সম্ভাবনা ক্রিয়াশীল রহিয়াছে"[৪] এই ধারনা আমরা কেবলমাত্র মার্কস ও হেগেলের দর্শন থেকেই পাই না । ভারতীয় দর্শনে বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায়, বিশদভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে । বৌদ্ধ দর্শনের একটি গুরত্বপূর্ন উক্তি হল ক্ষনিকত্ববাদ । অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুই কেবল একটা ক্ষনের জন্য স্থায়ী হয় । আর তার পরবর্তি ক্ষনেই বস্তুটি পরিবর্তিত হয়ে যায় । জগতের কোন বস্তুই একটি ক্ষনের বেশী স্থায়ী হতে পারে না । তেমনি ভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে হেরাক্লিটাস বলেন, 'একি নদীতে কেহ দুইবার স্নান করিতে পারে না ।' তিনি বলেন 'everything is in constant flux' ।[৫] মার্কসের দর্শনে পরিবর্তন বলতে কেবল এই সাধারন পরিবর্তনকে বোঝায় না । তিনি পরিবর্তনকে স্বীকার করেন কিন্তু পরিবর্তনের দ্বারা বোঝিয়েছেন দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামের ভিত্তিতে পরিবর্তন। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার পর থেকে সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে যে সমাজ ব্যবস্থা দেখা গেছে, তাতে সুনির্দিষ্ট এক ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক আধিপত্য করেছে। প্রতিটি স্তরেই একটি শ্রেণী আধিপত্য করেছে। প্রতিটি স্তরেই একটি শ্রেণী প্রভূত্ব করেছে এবং অন্য শ্রেণীগুলির উপর শোষণ ও অত্যাচার চালিয়েছে। সামাজিক বিকাশের ধারায় যখনি উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করেছে তখনি চুড়ান্ত পর্যায়ে পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে সামাজিক বিকাশের পরবর্তী স্তরের জন্ম হয়েছে। সামাজিক বিকাশের ইতিহাস একথাই প্রমানিত করছে যে, সমাজ বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে যে শ্রেণী প্রভূত্ব করে শোষণ করে সেই শ্রণী সবসময়ই পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। কারণ এর উপরই নির্ভর করে তার শোষণ করার ক্ষমতা, শ্রেণী হিসাবে তার অস্তিত্ব। অপর দিকে যে শ্রেণী শোষিত তারা চায় বর্তমান উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন। অনিবার্য ভাবেই শুরু হয় শোষক শ্রেণীর সাথে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত শোষিত শ্রেণী পুরাতন সমাজ ব্যবস্থাকে সবলে উচ্ছেদ করে, পূর্বতন শোষক শ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্টা করে। এইভাবেই শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ, সামন্ত সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজের উত্তরন ঘটেছে।

ধনতন্ত্রের স্বরূপ ঃ-

মার্কসবাদের মূল কথা, বৈষম্য সৃষ্টিকারী ও শোষণের হাতিয়ার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থাপনার গঠন। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পণ্য উৎপাদন। আর এটিই হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অপর আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্ধিত পরিমানে উৎবৃত্ত মূল্য অর্জন। এক্ষেত্রে কাজের সময় বাড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশি কাজ আদায় করা হয় এবং ধীরে ধীরে শ্রমিক হতে থাকে নিঃশেষিত। মার্কসই প্রথম পুঁজিবাদের অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন শ্রমিকের শ্রম চুরি করে কিভাবে পুঁজিপতিরা উৎবৃত্ত মূল্য অর্জন করে। মার্কস দেখিয়েছেন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যন্ত্রের বহুল ব্যবহার এবং শ্রম বিভাগের ফলে প্রলেতারিয়ানদের কাজের কোন ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যই থাকে না । এবং ফলে মজুরের কাজের আকর্ষন লোপ পায়। সে হয়ে যায় যন্ত্রের লেজুর। তার কাছে চাওয়া হয় শুধু সবচেয়ে সরল, অতি এক ঘোঁয়ে, অতি সহজে আয়ত্ব করা দক্ষতাটুকু। সুতরাং উৎপাদন খরচের মজুরির অংশটা সীমাবদ্ধ করা হয় প্রায় মজুরের বেঁচে থাকা এবং তার পরিবার রক্ষার পক্ষে জীবানোপায়ের মধ্যে। শুধু তাই নয় যে পরিমান যন্ত্রের ব্যবহার আর শ্রম বিভাগ বাড়ে সেই একই অনুপাতে বাড়ে খাটুনির চাপ। হয় পুঁজিপতির কাজের সময় বাড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশি কাজ আদায় করে বা তা করে যন্ত্রের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে। একটি দৃষ্টান্ত যেমন, 'অ্যাডাম স্মিথের তথ্যানুসারে, তার সময় কালে ১০ জন মানুষ সহযোগের মাধ্যমে তৈরী করত দিনে ৪৮,০০০ এর ও বেশী সুঁচ। অন্যদিকে একটি মাত্র সুঁচ তৈরীর মেশিনে ১১ ঘন্টার একটি কাজের দিনে তৈরী করে ১,৪৫,০০০ এর ও বেশী সুঁচ। একজন মহিলা বা একটি বালিকা তদারক করে এইরকম চারটি মেশিন; সুতরাং দিনে উৎপাদন করে প্রায় ৬,০০,০০০ সুঁচ এবং সপ্তাহে ৩০,০০,০০০ এর ও বেশী।'[৬] ফলে একদিকে বাড়তে থাকে পুঁজির পাহাড় অপরদিকে শ্রমিকের উপর চলতে থাকে চুড়ান্ত শোষণ। আর এই শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ শুরু করে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। লক্ষ্য একটাই শোষিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এক উন্নত সমাজ গঠন।

সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে বিপ্লব ঃ-

মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী মানব সমাজের ইতিহাস হল অবিরাম পরিবর্তনের ইতিহাস। আর সামাজিক এই পরিবর্তন সাধিত হয় বিপ্লবের মাধ্যমে। বিপ্লবের মাধ্যমেই পুরাতন সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে সেই স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থা। সমাজে যখনই উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রমিক শ্রেণীর সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে তৎসঙ্গে পরিবর্তিত হয় সমাজের ধ্যান-ধারনা, অভ্যাস বিশ্বাস প্রভৃতি। পরিবর্তিত হয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক চিন্তাধারা। মর্কসীয় দর্শনে সামাজিক বিপ্লব হল সামাজিক প্রগতির এক সুনির্দিষ্ট বিধি। আর সমাজের শ্রেণী দ্বন্দ্বই হল এই বিপ্লবের অন্যতম কারণ। এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব হল শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় বেশির ভাগই রাষ্ট্রশক্তি থাকে ধনী শ্রেণীর হাতে। তাই তারা অতি সহজেই সমাজের প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ককে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করতে পারে। তারা উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিক মুনাফা লাভের আশায় শোষণ চালায় শ্রমিক শ্রেণীর উপর। এই ভাবে শোষণের মাত্রা যখন চরম পর্যায়ে পৌছে যায় তখন সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম দেখা দেয় যা কালক্রমে বিপ্লবের রূপ নেয়। এই বিপ্লবের মাধ্যমে পুরাতন অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেই স্থলে সৃষ্টি হয় নতুন প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এই শ্রেণী সংগ্রাম, বিপ্লব ইত্যাদি ছিল না, কেননা তখন উৎপাদন ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। তাছাড়া জনসংখ্যা খুব কম থাকায় তখন উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজন ও ছিল না। সেই সময় উৎপাদিকা শক্তির প্রকৃতি ছিল খুব নিচু মানের। 'শিকার, মাছধরা, পশু পালন এবং ফলমূল সংগ্রহ এগুলি ছিল জীবিকা অর্জনের প্রধান পন্থা।'[৭] মানুষের নিজ শারিরিক শক্তি ছিল উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার। এই সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের হাতিয়ারের মান নিচু থাকায় বহুল পরিমানে উৎপাদন সম্ভব হত না । ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও ছিল না । ফলে উৎপাদনের উপকরনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপনের সুযোগ ছিল না । তখন সবাই সমান অধিকার ভোগ করত । কিন্তু কালক্রমে যখনই শ্রেনী বিভক্ত সমাজের উৎপত্তি হল তখন লোকসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিল, ফলে ভূসম্পত্তিতে মালিকানা দেখা দেয় । একটা শ্রেনীর হাতে চলে যায় সম্পত্তির মালিকানা । অপর দিকে আরেকটা শ্রেনী রয়ে যায় দূর্বল । ভূসম্পত্তিতে মালিকানা দেখা দেওয়ায় মালিক শ্রেনী উৎপাদন সামগ্রির সিংহ ভাগ দাবি করে, ফলে শ্রমিক শ্রেনী যারা শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করে তারা ক্রমশই অবহেলিত হতে থাকে । এইভাবে শোষনের মাত্রা যখন চূড়ান্ত রূপ ধারন করে তখন সৃষ্টি হয় দুটি শ্রেনীর মধ্যে সংগ্রাম যা কালক্রমে বিপ্লবের আকার ধারন করে এবং ফল স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে যায় পুরানো সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামো । সেই স্থলে দেখা দেয় নতুন সমাজ ব্যবস্থা । এই ভাবেই প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থাই বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন রূপ লাভ করেছে ।

এই ভাবেই মানব সমাজ আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাস সমাজে, তারপর ক্রমানুয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পরিবর্তিত হয়ে পুঁজিবাদী সমাজে এবং পুঁজিবাদী সমাজ থেকে গনতান্ত্রিক সমাজে রূপলাভ করেছে ।

চূড়ান্ত লক্ষ্য সমাজতন্ত্র ঃ-

মার্কস তাই পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক চরিত্র থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে পুঁজিবাদী সমাজ অবশ্যম্ভব ভাবে ধ্বংস হবে । এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে । এই ব্যবস্থায় শোষন ও শ্রেনীভেদ বিলুপ্ত হবে । উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে । মার্কস দেখিয়েছেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা শ্রেনীভেদকে লুপ্ত করে এক সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার সূচনা করবে। সমাজ ব্যবস্থায় এই যে পর্যায় এটাই হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজ যা মার্কসের মতে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যেমন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না এবং সে কারনে শ্রণী সংগ্রামের ও কোন প্রশ্ন ছিল না। তেমনি ভাবে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের ফলে সৃষ্ট সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ও থাকবেনা শ্রেণী শোষণ, শ্রেণী সংগ্রাম আর এটাই হবে সর্বোৎকৃষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা যেখানে প্রয়োজন হবে না শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে সমাজের পরিবর্তন। কাজেই মার্কসবাদ কেবল সমাজ পরিবর্তনই নয়, এ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে পুরানো ও অনুন্নত সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়ে শোষণহীন এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থার গঠন।

উৎস নির্দেশ ঃ-

১) টম বটোমোর- মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব, অনুবাদঃ হিমাংশু ঘোষ, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম অনুবাদ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-xxvi.

২) অনুনয় চট্টোপাধ্যায়-মার্কসবাদ ও সংস্কৃতি প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশন ২০০১, পৃষ্ঠা-১৫।

৩) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।

৪) সরোজ আচার্য-মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসীয় যুক্তি বিজ্ঞান, পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা ৭০০০০৬, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৮।

৫) ওয়াই মাসি-এ ক্রিটিক্যাল হিষ্টরি অফ ওয়েসটারন ফিলসফি, মতিলাল বেনারসি দাস পাবলিশার্স, দিল্লি, রিপ্রিন্ট ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৭।

৬) কার্লমার্কস-ক্যাপিটাল, বাংলা অনুবাদ পীযুস দাশগুপ্ত, বানী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশন ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-১২৬।

৭) শোভনলাল দত্তগুপ্ত, উৎপল ঘোষ-মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশন ২০০০, পৃষ্ঠা-৮২।

সহায়ক গ্রন্থ পঞ্জীঃ-

১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)- কার্লমার্কস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশন ১৯৮৫।

২) কার্লমার্কস ক্যাপিটাল, অনুবাদঃ পীযুষ দাশগুপ্ত, বানী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশন ১৯৮৩।

৩) দীপক কুমার বাগচী-ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশন ১৯৯৭।

৪) মরিস কর্নকোর্থ-দ্বন্দ্ব মূলক বস্তবাদ, অনুবাদঃ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশকাল ১৯৯৩।